ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি । ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক । চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে । এখনকার সঙ্গে তার অন্তরবাহিরের মাপ মেলে না । তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি । বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি , সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো । সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ , যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত । বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে । এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি — কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর-বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে । সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে । সমস্ত বিবরণটাকেই ছেলেবেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে , ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি । জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য । যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে । প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই ।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে , কিন্তু তার স্বাদ আলাদা , সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো । সে হল কাহিনী , এ হল কাকলি ; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে এটা দেখা দিচ্ছে গাছে । ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল , সেটা পদ্যের ফিল্মে । বইটার নাম ছড়ার ছবি । তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের , কিছু সাবালকের । তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের । এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা , হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো , শুধু ছিল না তার ডানা ।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক ,
বারান্দাটার রেলিঙ- ‘ রে ডাকত এসে কাক ।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ও পার থেকে
তপসিমাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে ।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের ‘ রে দাদা ,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা ।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে ,
মুখখানিতে-ঘেরদেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে ।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে ।
কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে ,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো , চাদর কাঁধে ঝোলে ।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া ,
থাকত আমার খাতা লেখা , পড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে ,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে ,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে ।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি , মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে ।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে , রাস্তা ভাসে জলে ,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে ।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা ,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা ।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি , জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি , ইয়াংসিকিয়াঙ —

জানার সঙ্গে আধেক-জানা , দূরের থেকে শোনা ,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা ,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা —
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে শ্যাওলা যেমন , মেঘের তলে পাখি ।

১

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায় । শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে , দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে । না ছিল ট্রাম , না ছিল বাস , না ছিল মোটরগাড়ি । তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না , রয়ে বসে দিন চলত । বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে , কেউ বা পালকি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে । যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা , চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা , কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে , দুই দুই সইস থাকত পিছনে , কোমরে চামর বাঁধা , হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপধরানো অন্ধকারে,গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা।রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ,পায়ে জুতো,দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি;তার মানে,লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া । কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে , ফস্‌ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে , জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে । ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ , তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও ; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেটাটোপের , দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান । পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি । ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো , দাড়ি চোমরানো , ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া , আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা । দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে , তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত । আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান , বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া । আমাদের পালোয়ান জমাদার শোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত , মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের , বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত , কখনো বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম ‘ রাধাকৃষ্ণ ' সে যতই হাঁ হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত । ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি ।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস , না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক । সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো । আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ ।

মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক । প্রথমে উঠত হাই , তার পর আসত ঘুম , তার পর চলত চোখ-রগড়ানি । বারবার শুনতে হত , মাস্টারমশায়ের

অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে , পড়ায় আশ্চর্য মন , ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে । আর আমি ? সে কথা বলে কাজ নেই । সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না । রাত্রি নটা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম । বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া , উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন । চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে । পিঠ উঠত শিউরে । তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে , ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে । কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর , দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে । ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি , তার লোভ ছিল মাছের 'পরে । বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদামগাছ , তারই ডালে এক পা আর অন্য পাটা তেতালার কার্নিসের ‘ পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি — তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল , মেনে নেবার লোকও কম ছিল না । দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই , দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে , তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে । সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে , টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়্সুড় করে উঠত ।

তখন জলের কল বসে নি । বেহারা কাঁখে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত । একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল । নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করেছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ , চোখ দুটো বুকে , কান দুটো কুলোর মতো , পা দুটো উলটো দিকে । সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম , তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা , পায়ে লাগাত তাড়া ।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত । ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জল বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে । যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত । মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত । দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম । শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে , পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ-ছায়া-পড়া আয়নাটা
যেন গেল সরে । সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে , কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না ।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে ।

২

পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের । খুব দরাজ বহর তার , নবাবি ছাঁদের । ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের । হাতে সোনার কাঁকন কানে মোটা মাকড়ি , গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে । এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা , কতক তার গেছে ক্ষয়ে , দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে , নারকোলের ছোবরা বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে । এ যেন একালের নামকাটা আসবাব , পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে । আমার বয়স তখন সাত-আট বছর । এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না ; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে । এইজন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল । ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ , আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্-ক্রুসো , বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি ।

তখন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক , আপন পর কত তার ঠিকানা নেই ; নানা মহলের চাকরদাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক ।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরিতরকারি , দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে , বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে , মাইনে করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালখের-কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে ; উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি । বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে । চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড় , ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন । ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে ।

বেলা বেড়ে যায় , রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে , দেউরিতে ঘন্টা বেজে ওঠে ; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘন্টার হিসাব মানে না । সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত , রাজা যেতেন সনানে , চন্দনের জলে । ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে । একলা বসে আছি । চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি , হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ । চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে । সেই পথে চলেছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে , সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া । কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে । বাঘের চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌

করছে , গা করছে ছম্‌ছম্‌ । সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী , বন্দুক ছুটল দুম্‌ , ব্যাস্‌ সব চুপ । তার পরে এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি , ভেসে চলে সমুদ্রে , ডাঙা যায় না দেখা । দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্‌ ছপ্‌ছপ্‌ , ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে । মাল্লারা বলে ওঠে , সামাল সামাল , ঝড় উঠল । হালের কাছে আবদুল মাঝি , ছুঁচলো তার দাড়ি , গোঁফ তার কামানো , মাথা তার নেড়া । তাকে চিনি , সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম ।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল — একদিন মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে , হঠাৎ এল কালবৈশাখী । ভীষণ তুফান, নৌকা ডোবে ডোবে । আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে , সাঁৎরে উঠল চরে , কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল , আমার পছন্দ হল না । নৌকাটা ডুবল না , অমনিই বেঁচে গেল , এ তো গপ্‌পই নয় । বারবার বলতে লাগলুম ‘ তার পর '?

সে বললে , ‘ তার পর সে এক কাণ্ড । দেখি , এক নেকড়ে বাঘ । ইয়া তার গোঁফজোড়া । ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে । দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ ভেঙে পড়ল পদ্মায় । বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে । খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে । তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস । জানোয়ারটা এত্তো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল আমার সামনে । সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে । আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল । বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে , কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না । আমি ডাক দিলুম ‘ আও বাচ্ছা ' । সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে , ছাড়াবার জন্যে যতই ছটফট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে ' ।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম , ‘ আবদুল , সে মরে গেল নাকি ' ।

আবদুল বললে , ‘ মরবে তার বাপের সাধ্যি কী । নদীতে বান এসেছে , বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো ? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা । গোঁ গোঁ করতে থাকে , পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা , দশ-পনেরো ঘন্টার রাস্তা দেড় ঘন্টায় পৌঁছিয়ে দিলে । তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা , জবাব মিলবে না ' ।

আমি বললুম , ‘ আচ্ছা বেশ , বাঘ তো হল , এবার কুমির ?'

আবদুল বললে , ‘ জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার । নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায় , মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে । বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত । লাইসেন্স্‌ ফুরিয়ে গেছে । কিন্তু মজা হল । একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে , তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা । কখন নদীর থেকে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল । বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে

বসল তার পিঠের উপর । দা দিয়ে ঐ দানোগিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল । ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে ' ।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম , ‘ তার পরে ?'

আবদুল বললে , ‘ তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায় , তুলে আনতে দেরি হবে । আসছেবার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব ' ।

কিন্তু আর তো সে আসে নি , হয়তো খোঁজ নিতে গেছে ।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সফর ; পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি , রেলিঙগুলো আমার ছাত্র । ভয়ে থাকত চুপ । এক-একটা ছিল ভারি দুষ্ট , পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই ; ভয় দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে হবে । মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে , দুষ্টুমি থামতে চায় না , কেননা থামলে যে চলে না , খেলা বন্ধ হয়ে যায় । আরও একটা খেলা ছিল , সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে । পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে । তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি । মন্তর বানাতে হয়েছিল , নইলে পুজো হয় না । —

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস ।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা , কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের । আখরোট খেতে ভালোবাসতুম । খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের । আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না ।

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই । কেবলই চলছে বৃষ্টি । গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে । পাখির ডাক বন্ধ । আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা ।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে । তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি । সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি , তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন । তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে ,He is down তিনি হন নীচে , তখনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি ।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা । যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে ।

সেই তোশাখানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জ্বলছে মিট মিট করে , গণেশমার্কা ছবি আর কলীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে , তারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে । ঘরে কোনো আসবাব নেই , মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা ।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো । গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া । পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে । অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে । যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন , মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল । সাবেক কালের বড়োমানুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল ।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর । চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা , মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া , গম্ভীর মেজাজ , কড়া গলা , চিবিয়ে চিবিয়ে কথা । তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত , নামডাকওয়ালা । সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে । শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে । এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত । বাবুরা ‘ বসে আছেন ' না বলে সে বলত ‘ অপেক্ষা করে আছেন ' । শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন । যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই । স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাষা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব । স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে । চালচলনে কোন্‌টা ঠিক , কোন্‌টা ঠিক নয় , এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত । এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা , তাতে তার কথার মান বাড়ত । কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে । ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল খুব চাপা । আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না । আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত , ‘ আর দেব কি ' । কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে । আমি প্রায়ই বলতুম , ‘ চাই নে । ' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি

করত না । দুধের বাটিটার ‘ পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল , আমার মোটে ছিল না । শেলফওয়ালা একটা আলমারি ছিল তার ঘরে । তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ , আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি । বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত ।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল । সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই । যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না । শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে , ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না । জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন , সর্দি হল না । কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি , চুল জামা গেছে ভিজে , গলার মধ্যে একটু খুসখুসানি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি । আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে , কেবল দরকারমতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে । শুনে মা মনে মনে হাসতেন , একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি । তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন , ‘ আচ্ছা যা , মাস্টারকে জানিয়ে দে , আজ আর পড়াতে হবে না । '

আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন , ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান । এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হত , তার উপরে খেতে হত কানমলা । হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল । চিরকালের জন্যে আরাম হত ব্যামোটা । দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে ; তাকে চক্ষেও দেখি নি । ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস । জল খেতে পেতুম অল্প একটু , সেও গরম জল । তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত । তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত ।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না । ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না । ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা , কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন । গায়ে ফোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন । হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে । শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো ।

মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন । খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা ; বিশেষ করে এই কলের জাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল দেওয়া ঘি-তেলের দিনে । একটা কথা মনে রাখা দরকার , তখনও বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি । ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি । গোলাপি গন্ধের আমেজদেওয়া এই তিলে-ঢাকা

চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চটচটে করে তোলে কিনা জানি নে — নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে । সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায় । আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা ? সে কি এখনও টিঁকে আছে । না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই ।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা । সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে । সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ । সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা । ওরে রে লক্ষ্মণ , এ কী অলক্ষণ , বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ । তার মুখে হাসি , মাথার টাক ঝক ঝক করছে , গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে , পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ । সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাৎলানো ।

কিশোরী চাটুজ্যের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে , দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি , এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হতে পারলুম না । পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত ।

রাত হয়ে আসত , মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে । ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে । মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন । পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চকচকে , মস্ত তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন , ‘ জ্বালাতন করলে , যাও খুড়ি , ওদের গল্প শোনাও গে । ' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম । সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা । মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে । রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে । তখনও শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে ফুকরে উঠত ।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না । এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন । সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু বিশ্রাম নেই । উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন । তেলকল চলে না , ষ্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে , কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে , পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহুরে গোষ্ঠে । সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন , এখনও তার নাড়িগুলো যেন দব দব করছে । রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে , কেবল সামান্য কিছু ছাই-চাপা । রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটেছে দশ দিকে ; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম ।

আমাদের সেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায় । ঘরে-বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম থম করত । ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত । চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত ‘ বরীফ ' । হাঁড়িতে বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হোত কুলফির বরফ , এখন যাকে বলে অইস কিংবা আইসক্রীম । রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কী রকম করত তা মনই জানে । আর-একটা হাঁক ছিল ‘ বেলফুল ' ।

বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই , কেন জানি নে । তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে । গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত । বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত নানা কারিগরিতে । তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি , পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা । নাপতিনি আসত , ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত । মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে । ট্রামের পায়দানের উপড় ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না । ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমাহলের সামনে । নাটক-অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল , কিন্তু কী আর বলব , আমরা সে-সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না । যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত ‘ যাও খেলা কর গে ', অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমতো গোল করত তা হলে শুনতে হত ‘ চুপ করো ' । বড়োদের আমোদ-আহ্লাদ

সবসময় খুব যে চুপচাপে সারা হত তা নয় । তাই দূর থেকে কখনো কখনো ঝরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের দিকে । এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম , দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময় । দেউরির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে । সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন , হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া । নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে , তার মর্ম বুঝতে পারি নে । বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল । খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে , কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি । তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে , তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা । বৈঠকখানায় ঝাড়-লন্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান , গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল , মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে , চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে , সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন , ফিস্‌ফিস করে চলত গেরস্তালির খবর । ছেলেরা তখন বিছানায় । পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে , কানে আসছে —
‘ জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে — '

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন । মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল । আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি । পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর , ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল । ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যাবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা । এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত । দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয় । তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায় । আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে । কিন্তু রাস্তা নেই , ছিলুম ছেলেমানুষ । আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর । বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল , চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া । ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা , চোখে-কালি-পড়া , অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে । পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে । সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাক্সোয় । দেউড়ির দরজা খোলা , উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড় । চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে , ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায় । রাত্রি হবে নটা , পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম , কড়া-পড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে , ‘ মা ডাকছে , চলো শোবে চলো । ' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত , হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে । বাইরে চলছে হাঁকডাক , বাইরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন , আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই , পিলসুজের উপর টিম টিম করছে পিতলের প্রদীপ । ঘুমের ঘোরে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল ।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম । কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল , হুকুম বেরল , ছেলেরাও যাত্রা শুনতে যাবে।ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে।বারবার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেওয়া হবে । উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি , কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না , কেননা তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো ।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম । তার একটা কারণ , মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন , আর-একটা কারণ নটার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ-একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত । এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে । চোখে ধাঁধা লেগে গেল । একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে , সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত । এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে । বাকি

জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে । থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল , আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি । তাদের বেশির ভাগ মানুষই , ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক । তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে , যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্‌শো করে নি । এর সুর , এর নাচ , এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা ; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে ।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম , রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন । বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি । এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা , আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম ।

রাত ফুরোত , যাত্রা ফুরোতে চাইত না । মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি । জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা । যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে , উঠোনসুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান । ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোশে শুয়ে আছি । বেলা হয়েছে বিস্তর , ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর । সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি , এ ঘটে নি আর কোনদিন ।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো । মাঝে-মাঝে তার ফাঁক নেই । রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা , যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে । সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা । ঘন্টা কয়েক তার মেয়াদ , পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে , আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে ।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর । মাঝে-মাঝে পালপার্বণে যখন মর্জি হত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত । এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর , হরেক রকমের ঝকঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায় । বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে , ছোটো রাস্তা থেকেও ।

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেশ্বর । ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম — বাড়ি যশোরে , খাঁটি পাড়াগেঁয়ে , ভাষা তার কলকাতায়ি নয় । সে বলত , তেনারা ওনারা , খাতি হবে , মুগির ডাল কুলির আম্বল । ‘ দোমানি ' ছিল তার আদরের ডাক । তার রঙ ছিল শ্যামবর্ণ , বড়ো বড়ো চোখ , তেল-চুক্‌চুকে লম্বা চুল , মজবুত দোহারা শরীর । তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না , মন ছিল সাদা । ছেলেদের ‘ পরে তার ছিল দরদ । তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম । তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে । ডাকাতি এখনো কম হয় না — খুনও হয় , জখমও হয় , লুঠও হয় , পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না । কিন্তু এ হল খবর , এতে গল্পের মজা নেই । তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে , অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে । আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে । মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল , সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাকরেদ । তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত । প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাবির ব্যাপার ছিল না । তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন । এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল । যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে , এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা । অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা । গল্প শুনেছি , সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায় । সেদিন অমাবস্যা , পুজোর রাত্তির , কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপড়ে বললে , ‘ এ যে আমারই জামাই! '

আরও শোনা যেত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা । তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত , ইতরপনা করত না । দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে । মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা । একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্‌টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল ।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল । মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব , লম্বা লম্বা চুল । ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে । ঝাঁকড়া চুলে মানুষ দুলিয়ে লাগল ঘোরাতে । লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায় । একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট করে বেরিয়ে গেল । দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালোমানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে , তাও দেখালে । খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা । এই লাঠিকে বলে রঙপা । দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা

ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত , ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশি । ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না তবু এক সময়ে এই রঙপায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম । ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে ।

ছুটির রবিবার । আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে , গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের । ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক । পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম । সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায় , উড়ো ঠিকানায় , গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে । নিঝুম অন্ধকারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই হুই হাঁই হুই , গা করছে ছম ছম । ধূ ধূ করে মাঠ , বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে । দূরে ঝিক ঝিক করে কালিদিঘির জল । চিক চিক করে বালি । ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায় , ঘন বেতের ঝোপে । যত এগোচ্ছি দুর দুর করছে বুক । বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে । কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে । জল খাবে , ভিজে গামছা জড়াবে মাথায় । তার পরে ?

‘ রে রে রে রে রে রে! '

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই । ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে । তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা । তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে । তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে , এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না । আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল ।

সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন । যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে । তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায় ।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন । তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয় নি সে আমরা জানি । তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না । বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে , কান দোরস্ত হয়ে যায় , আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না । এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে । গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল । বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন । সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায় । দুই-একটা নমুনা দিই —

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উলকি পরাতে ।
আবার উলকি পরা যেমন-তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুরঝি ,
উলকির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি ।

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে । যেমন —

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে , জোনাক জ্বালে বাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হল ,
ফার্সি পড়ে তাঁতি ।

গণেশের মা , কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না ,

তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনো ।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায় । যেমন —

এক যে ছিল কুকুরচাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন ।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো , তার পরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া । তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন , ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস , আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয় । তা ছাড়া , এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না । আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে , শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায় — এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল ।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে , কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি । কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি ।

আমার দোষ হচ্ছে , শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি । ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই । মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না , কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর । যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি । কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে । সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন অতি-গজ-গামিনী রে , আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি । সন্ধে-বেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল ।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন । বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন , হাতে থাকত গুড়গুড়ি , অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে , গুন গুন গান চলত , ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে । তিনি তো গান শেখাতেন না , গান তিনি দিতেন ; কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না । ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন , নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার , হাসিতে

বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত , গান ধরতেন —

‘ ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী ' ।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না ।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার । চেনাশোনার খোঁজখবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না । যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত , অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে । সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপমোড়া তম্বুরা কাঁধে করে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন । কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে । সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক তেমনি পান । তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ— পান সাজতে হত রাশি রাশি , বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চট্‌পট্ পানে চুন লাগিয়ে ,কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমতো মসলা ভরে , লঙ্গ দিয়ে মুড়ে সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায় ; উপরে পরত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা । ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম । মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল , আলোবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো , তাদের নাড়ির মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ । বাড়িতে যাঁরা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম আসুন মশায় ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে । তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার । সেই ভরপুর পানের গামলা অনেকদিন হল সরে পড়েছে , আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে ।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমতো রয়ে গেলেন কিছুদিন । কেউ প্রশ্নও করলে না । ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম । নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই , তাদের শখ অনিয়মের শেখায় । সকাল বেলায় সুরে চলত বঙশী হমারি রে ।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট । একটা মস্ত ভুল করলেন , জেদ ধরলের আমাকে গান শেখাবেনই ; সেইজন্যে গান শেখাই হল না । কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে — ভালো লাগল কাফি সুরে রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া , রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে । মুশকিল হল , এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে কয়ে । বাঘমারা বলে তাঁর খ্যাতি । বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত , কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে । যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি , কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে — তখন সে কথা ভাবি নি , এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি । তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য

ঘন ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল । দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ ।

এই তো গেল গান । সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের । বিশেষ কিছু ফল হয় নি , সে স্বভাবদোষে । আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন , মন , তুমি কৃষিকাজ বোঝো না । কোনোদিন আবাদের কাজ করা হয় নি ।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া যাক ।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি , কুস্তির সাজ করি , শীতের দিনে শির্‌শির্ করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে । শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল , কানা পালোয়ান , সে আমাদের কুস্তি লড়াত । দালানঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি , তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি । নাম শুনে বোঝা যায় , শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগা-গোড়া চাপা দিয়ে বসে নি , কিছু কিছু ফাঁক ছিল । শহুরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত , খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ । এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর । এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল । সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র । খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম । সকাল-বেলায় রোজ এত করে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের , তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে । তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে । এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে , তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে । তাতে ছিল বাদাম-বাটা , সর , কমলালেবুর খোসা , আরও কত কী — যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যাবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না । রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত , অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে । এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে , জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে , তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে ।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যা শেখাবার জন্যে । দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল । রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত , হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে । তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল , তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে ।

দেউড়িতে বাজল সাতটা । নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট । এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না । খট্‌খটে রোগা শরীর , কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো , এক দিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না । বই নিয়ে শ্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে । কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত — সবই বাংলায় , পাটিগণিত , বীজগণিত , রেখাগণিত । সাহিত্যে ' সীতার বনবাস ' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ' মেঘনাদবধ ' কাব্যে । সঙ্গে ছিল প্রাকৃত-বিজ্ঞান । মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত , বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে । মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তর্করত্ন । লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে । এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি করে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে , জালের মধ্যে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায় , আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না ।

বারান্দার আর-এক ধারে বুড়ো দরজি , চোখে আতশ কাঁচের চশমা , ঝুঁকে পড়ে কাপড় সেলাই করছে , মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে — চেয়ে দেখি আর ভাবি কী সুখেই আছে নেয়ামত । অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায় চোখের উপর স্লেট আড়াল করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি , দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান , লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে । পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ ছিপে ছোকরা দরোয়ান , কুটছে তামাক । ঐখানে ঘোড়াটা সক্কালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা , কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা , জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে — ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া ।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি । কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করছে । নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই , আর দেওয়া চাই জল । শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি । যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে ।

সুর্য উপরে উঠে যায় , অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া । নটা বাজে । বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে । সাড়ে নটা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ । রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার । বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার । বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে । গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে , তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে , কোনো তাড়া নেই । মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না । মনে হত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের । বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার

দশটা-চারটার আন্দামানে । সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে । জিম্‌নাষ্টিকের মাস্টার এসেছেন । কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি । তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার ।

ক্রমে দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে । শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইঁটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি । অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত । শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া । কালো মলাটের রীড়ার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলের উপর । মলাটটা ঢল্‌ঢলে , পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে , কিছু দাগি , অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে — তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর । পড়তে পড়তে ঢুলি , ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি । যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি ।

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময় । সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না-

‘ রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে ' ...

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা , না আছে ভূতপ্রেতের । পূর্বেই জানিয়েছি , অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড় । ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি । এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলার চারকোনা দেয়ালের প্যাক্‌বাক্সে ।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ । মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে , তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে । সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না । দরকার কেবল সময়-কাটানো । তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্যে নানা দামের নানা মালমসলার বরাদ্দ ছিল না । দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা , ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো । পুরুষদের মজলিসেই হোক , আর মেয়েদের আসরেই হোক , গল্পগুজব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দামের । মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন , যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হত , তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহকরবার কাজে । প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে । তাই নিয়ে গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নের হিসেব হত খুব ফলাও খরচার । এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি , শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবী থেকে ন কোটি মাইল দূরে । ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বারবিসর্গ-সুদ্ধ ; মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি , তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে , এ কথা কে জানত বলো ।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে । ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া । ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি , জারক নেবুতে দিত জারিয়ে । ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাঁটা নিয়ে । টিপে টিপে টপ্‌টপ্‌ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে ; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে । তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ । কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকনো হত , ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানাকাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত , রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার । কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে , তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে । যখন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে

, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না । যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই । তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের — কী বলব — চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম । কেননা রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে , এমন-কি না হলেও , অপহরণ করে থাকেন আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান , শূলে চড়ান । শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের । বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর , বউদিদির আমসত্ত্ব পাহারা , তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি । পড়ে শোনাতুম ' বঙ্গাধিপ পরাজয় ' । কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার । খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম । আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল , সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না , এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন । কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না । তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে । উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি ।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল । এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল , যখন হত নাড়ুকোটা , যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত , আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে । রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না , নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে । আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে — বোতলে ভরা , গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ ।

পাড়াগাঁয়ের আরও-একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে । ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত । কেবল বাড়ির নয় , পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায় । আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে-অ স্বরে-আর উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম , কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই ।

তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে , আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার — বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে । আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক ।

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ । ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে । আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে । চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে

কতদিন দেখেছি , তখনো সূর্য ওঠে নি , তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন , কোলে দুটি হাত জোড়-করা । মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে , তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ । চিরদিনের নীচেতলায়বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল ; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া । ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে । নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে , মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা । আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায় । বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে । ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির , বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময় । খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিট্‌কিনি দিতুম খুলে । দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা ; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম । আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা , পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে , গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে ।

রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর , চিল ডেকে যেত আকাশে । সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা । সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই , আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা ।

হঠাৎ তাদের হাঁক পোঁছত যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ , দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে , বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমতো বেলোয়ারি চুড়ি । সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌএর পদ পায় নি , সেকেণ্ড্‌ ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে । আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে । ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি , ধু ধু করছে চার দিক । গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে , আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে ।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল । আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই । তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল । লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর , তাকে যেন বাংলা দেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে । কল দিতুম খুলে , ধারাজল পড়ত সকল গায়ে । বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম ।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল । নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে । রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে । আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে । নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে ।

এখন জলখাবারের সময় । এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লালচিহ্ন-দেওয়া দিনের ভাগ । জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিম্মায় । তখনকার দিনে দোকানিরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না , গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি । যদি জুটে যেত কচুরি সিঙাড়া , এমন-কি আলুর দম , সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না । কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকিয়ে বলত ‘ দেখো বাবু আজ কী এনেছি ', প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম-ভাজা! সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয় , কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর । কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি । এমন-কি , যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না ।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে । মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল , নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে — পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে । লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে , বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে , রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে ।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা । দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে , সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ । ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুয়ের গুঁতো মারে । রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা ।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে । ইস্কুলঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়া-তৈরি পথের সিগ্‌ন্যাল । এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ-ওয়ালা । আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে । এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা , একটু দেয় নতুনের আমেজ । আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগ্‌ডুগি বাজে না । সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে । শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত ।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের । ছিল মার্বেল , ছিল যাকে বলে ব্যাটবল — ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব । আর ছিল লাঠিম-ঘোরানো , ঘুড়ি-ওড়ানো । শহরে ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কম্‌জোরি । মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লম্ফঝম্ফ তখনো ছিল সমুদ্রপারে । এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে ।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে । বাড়িতে এল নুতন বৌ , কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি । পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া , দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ । দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই , সাহস হয় না কাছে আসতে । ও এসে বসেছে আদরের আসনে , আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা । পুরুষরা থাকে বাইরে , মেয়েরা ভিতরকোঠায় । নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে । মনে আছে দিদি বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে , মনের কথা বলাবলি চলছিল । আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক । এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের । আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে ।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা খইয়ে দেয় , এবার তাই ঘটল । বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী । বৌঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে । সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল । পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে । নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ । বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো , খাওয়াতে ভালোবাসতেন , এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন । ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ । চিংড়িমাছের

চচ্চিড়র সঙ্গে পানতা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে , সেদিন আর কথা ছিল না । মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন , ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না , তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম । বলতে হত , “ তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে । আমি কি চৌকিদার । '

তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন , ‘ তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না , নিজের হাত সামলিয়ো । '

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে , তাঁরা বলবেন , নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে । কথাটা মানি । এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে । তখন বড়ো-ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ ।

এইবার আমার নির্জন-বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক-পালা — এল মানুষের সঙ্গ , মানুষের স্নেহ । সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা ।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল , নামল নতুন ঋতু ।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন । জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে । আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে ।

অন্দর মহলের পর্দা রইল না । আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না , কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না । তারও অনেক কাল আগে , আমি তখন শিশু , মেজদাদা সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন । বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বৌঠাকরুনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন । বাড়ির বৌকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট , তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই — এ যে হল বিষম বেদস্তুর । আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তখনও মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি । এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন ।

বেণী দুলিয়ে তখনও ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা । অন্তত আমাদের বাড়িতে ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের । বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হল আমার বড়দিদির ছিল অল্প বয়স । সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি । ধবধবে তাঁর রঙ । এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না । শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল ।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না । কিন্তু এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে । আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো । বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য । আরও আশ্চর্য এই যে , তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনও আমার মুখ চাপা দেন নি । তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি । আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস । পাঁচরকম কথা পাড়ি , দেখি তাদের মুখ বোজা । জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে । বুঝতে পারি , এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা । জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের ; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে ।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো । আর এল একালের বার্নিশকরা বৌবাজারের আসবাব । বুকের ছাতি উঠল ফুলে । গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি ।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা ।

জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন , আমাকে রাখতেন পাশে । তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার ।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া । একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে , পিরিচে একগ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান । বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন । গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা , বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি , আমি ধরতুম চড়া সুরের গান । গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি । সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান । হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে , তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে ।

ছাদটাকে বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন । পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ , আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা । ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি , সবাই ছিলেন খেয়ালি ।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী । তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন , অন্যেরা আরও বেশি জানত । কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না । বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ । চোখ বুজে গাইতেন , যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না । হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন । মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত । ভাবে ভোর মানুষ , তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না ।

সন্ধেবেলার সভা যেত ভেঙে । আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে । সকলে শুতে যেত , আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম , ব্রহ্মদত্তির চেলা । সমস্ত পাড়া চুপচাপ । চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা । ছাদের বাইরে শিশু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে , ঝিলি্মিল্ করছে পাতাগুলো । জানি নে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে ।

রাত একটা হয় , দুটো হয় । সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে ,

‘ বলো হরি হরিবোল । '

১১

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল । সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ার কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক । বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি । কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিষ উঠত ফোয়ারার মতো । আরও ছিল নানা জাতের পাখি , তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায় । রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত । তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ , ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু ।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন । কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না । একবার বৌঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা । আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে , তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না । একে ঠিক জবাব বলা চলে না । কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল । তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম , কোনো জবাব করি নি ।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না , সে কথা বলছি ।

উমেশ ছিল চালাক লোক । বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত , তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত । কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে , বলত ‘ এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন ' । ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না । আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে । বারবার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি , জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না । আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি , এর চেয়ে অনেক ভালো , অনেক ভদ্র , সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই । আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙকরা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না । উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি-পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো । চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না ।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি , কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না ; আর হেরেছি দাবাখেলায় , সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা ।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরও কিছু বলার দরকার হবে । শুরু করতে
ছেলেবেলা
হবে আরও-একটু আগেকার দিনে ।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে । একবার যখন সেই দরকারে

বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে । তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর , অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত , বাড়াবাড়ি হচ্ছে । তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন , ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো । তিনি বুঝে নিয়েছিলেন , আমার ছিল আকাশে বাতাসে চরে বেড়ানো মন — সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই । তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে ।

পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল । পদ্মা ছিল দূরে । নীচের তলায় কাছারি , উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা । সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ । ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ , এরা একদিন-নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল । আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম থম করছে । কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান , কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল , কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ায় চড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত — ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক , রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা , হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপরওয়ালাদের কানে পৌঁছত না , সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত । সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে , কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর । লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে , আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো দুপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে ।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি । ছোটো একটি কোণের ঘর , যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি । অজানা ভিন দেশের ছুটি , পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না । বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই , উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই । এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে । সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল — ঝরেও গেছে ।

তখনকার দিনে অল্প বয়সের ছেলে , বিশেষত মেয়ে , যদি অক্ষর গুণে দু ছত্র পদ্য লিখত তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত , এমন যেন আর হয় না , কখনো হবে না ।

সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি , কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে । তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দো অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে , অমনি তাদের সেই নামমোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে ।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম , লজ্জা অনেক বেশি । সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না , এক আমি ছাড়া । আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে একদিন বাৎলিয়ে দিলেন চোদ্দো অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে

পদ্যে । স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার । আর হাতে হাতে সেই চোদ্দো অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল ; এমন-কি তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল । কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে , সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি ।

মনে আছে , ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে , আমি কবিতা লিখি । আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে , ভাবলেন নর্মাল-স্কুলের নাম উঠবে জ্বল্‌জ্বলিয়ে । লিখতে হল , শোনাতেও হল ক্লাশের ছেলেদের , শুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি । নিন্দুকরা জানতে পারে নি , তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাব-চুরিতে হাত পাকিয়েছি । কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস ।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম , তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে , সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায় , তাকে ধরা যায় না । অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন ; আত্মীয়রা বললেন , ছেলেটির লেখবার হাত আছে ।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উলটো । কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব , এ তিনি কিছুতে মানতেন না । কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন , কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না । আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম , তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত ।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন । বৌঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন , এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল । শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টুঘোড়া । সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না । আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে । সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম । আমি পড়ব না , তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি । কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন । সে টাট্টু নয় , বেশ মেজাজি ঘোড়া । একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত । পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ।

বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন , সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি । বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে । বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল , শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে । তখনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন । আশ্চর্যের কথা এই , আমাকেও নিলেন সঙ্গে । একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে , এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না ।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ । সে জানত , মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয় । বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি । একবারও ফসকায় নি তার

তাক ।

ঘন জঙ্গল । সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না । একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে । জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে । আমার পায়ে জুতোও নেই , বাঘটাতাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তার উপায় ছিল না । বিশ্বনাথ ইশারা করলে । জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না । তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোখে পড়ল । মারলেন গুলি । দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায় । সে আর উঠতে পারল না । কাঠকুটো যা সামনে পায় কামড়ে ধরে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল । ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে । অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল , সেটা ওদের মেজাজে নেই বলেই জানি । তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো! এত ঘুম কেন ।

আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে । আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে , হাতির পিঠে চড়ে । আখের খেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি ভারিক্কি চালে । সামনে এসে পড়ল বন । হাঁটু দিয়ে চেপে , শুঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে । তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম , সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে থাবা বসিয়ে ধরে । তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে , পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না । সেদিন হাতির উপর চড়ে বসে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড়-ভাঙার ছবিটা । ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায় । বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে , ও দিকে । যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয় । ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে । এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল । মাহুত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না । দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের ‘ পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি । জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন , নিশ্চয় এটাই ছিল তার সবচেয়ে ভাবনার কথা । হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ । যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা । আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল দেখা নজর —— এ যে ঘাড়েগর্দানে একটা একরাশ মুরদ , অথচ তার ভার নেই যেন । খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে । কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ । মাঠে ফসল ছিল না । ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে —— সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ ।

আর-একটা কথা বাকি আছে , শুনতে মজা লাগতে পারে । শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত । আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা

লিখতে । টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না । ভাবতে লাগলুম , একটা কল তৈরি করা চাই । ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি , আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামানদিস্তের নোড়া হলেই চলবে । সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে-বাঁধা একটা চাকায় । জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম । হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন , বাইরে সেটা ধরা পড়ল না । হুকুম করলেন , ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে । কল তৈরি হল । ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায় , রস বেরয় না । জ্যোতিদাদা দেখলেন , ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না । তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না ।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম । যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে , তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন , শাস্ত্রে এমন কথা আছে । সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন , তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ , এমন-কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াই নি ।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি , ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন । বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই । জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন । শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর ।

১২

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে ।

একদিন গোলাবাড়ি , পালকি , আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা — কখনো এখানে , কখনো ওখানে । বৌঠাকরুন এলেন ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা । উপরের ঘরে এল পিয়ানো , নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল ।

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে । সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া । তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে । ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত — কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর ‘ পরে লক্ষ করে । দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়ে , ছাতটা উঠত তেতে ।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে । বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন । নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে , আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি । গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা । সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে ।

তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে ; সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে । কী হল কী হবে , দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা ।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না । আমার সুবিধে ছিল , কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না ; কেননা আমার একটা গুণ ছিল , আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম । আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন । তখন বিজ্‌লিপাখা ছিল না , পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম ।

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে । বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি । মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা , আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁসে দেয় নি কালো নিশ্বাস ।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে , ছোটো সে দোতলা বাড়ি । নতুন বর্ষা নেমেছে । মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে , মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও বনের মাথায় । অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি , সেদিন তা হল না । বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে —

‘ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর ,
শূন্য মন্দির মোর । '

নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম । গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে , থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর , ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায় , ডিঙিনৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে , ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর । বৌঠাকরুন ফিরে এলেন ; গান শোনালুম তাঁকে ; ভালো লাগল বলেন নি , চুপ করে শুনলেন । তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো । যা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তখনো চলে , কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে ।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে । সেটা রাজবাড়ি বললেই হয় । রঙিন কাঁচের জানলা-দেওয়া উঁচুনিচু ঘর , মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে , ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায় । ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে , সেই সবরমতী নদীর ধারের পায়চারির সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত । সে বাগান আজ আর নেই , লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা ।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায় । সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না , ছিল হাতের গুণ । মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন , তাতে পড়ত গাওয়া ঘি । ঐ

‘ আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে

কী জানি পরান কী যে চায় ' ।

আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান —

‘ হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-সনে ' ।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো , সে তাঁর সাঁতার কাটা । পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতেন । পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত । তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে । শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই । পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে । জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত । তার পরে আর ডোববার জো থাকত না । বড়োবয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম । কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয় । মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো ; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে , শুনিয়েওছি অনেকবার । ছেলেবেলায় যখন গিয়েছি ড্যালহৌসি পাহাড়ে , পিতৃদেব আমাকে একা-একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি । পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম । তার সকলের চেয়ে মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা । একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর । পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম । কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম । ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত । কী যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মার কাছে বলেছি । তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত , এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে । ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি , কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে । আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ-সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাত নয় ।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন , ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল ।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে । আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল , জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে । তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে ; মেজবৌঠাকরুন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে , ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায় ।

শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে । নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল । গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা । নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা । যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না , আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার , আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত ।

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল । জজের বাসা ছিল শাহিবাগে , বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে । দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে ; বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে , সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি । সামনে প্রকাণ্ড চাতাল , সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে । চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার ।

কলকাতায় আমরা মানুষ , সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি । আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা । আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে , দেখা যাচ্ছে তার পিছনফেরা বড়ো ঘরোয়ানা । তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা । আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ‘ ক্ষুধিত পাষাণ ' এর গল্পের ।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা । নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে , রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে , ঘোড়সওয়ারতুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ , তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে । বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌ । অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে । বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা , উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি । আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ , ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো ; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ , নেই সেই-সব ধ্বনি — শুকনো দিন , রস-ফুরিয়ে যাওয়া রাত্রি ।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে ; তার মাথাটা খুলিটা আছে , মুকুট নেই । তার উপরে খোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে । চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম , সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা । কিছু মনে থাকে , অনেকখানি ভুলে যাই বলে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয় । আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে-একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না , অনেকখানি সে মনগড়া ।

এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন , বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে

পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে । ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায় । তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম । সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে । আমার বিদ্যে সামান্যই , আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না । তা করেন নি । পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না , তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে । আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন । যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম , তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি , মেনে নিয়েছিলেন । কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন , দিলেম জুগিয়ে — সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে । ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে । বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে ; শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে ; বললেন , ‘ কবি , তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি । '

এর থেকে বোঝা যাবে , মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে , সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই । মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ । সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত । যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন , ‘ একটা কথা আমার রাখতেই হবে , তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না , তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে । '

তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি , সে কথা সকলেরই জানা আছে । আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে । তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে । তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে । তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী , হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায় । না ডাকতেই আসে , শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না । চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয় , বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে ।

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি । একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল — সেটাকেই বলি ছেলেবেলা , সেটাতে মিশোল বেশি নেই । তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল , আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে । অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায় । এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন-পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায় ।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম । মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন । জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র , বি. এ. পাশ-করা । তিনি বুঝে নিয়েছিলেন , লেখাপড়া-শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না । মুশকিল এই যে , পাশ-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে , এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি । সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না । আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল , তাই রীতিটা টিঁকে গিয়েছিল । লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে । ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে । আর-কিছু না হোক , ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে , অভিভাবকদের এই ছিল আশা । ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা , সকলরকম এক্সে সাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা । আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন । ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন , পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাই নি , মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা । জ্ঞানবাবু কতকটা সেইরকমই ঠিক করেছিলেন । কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন । আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব । ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ তর্জমা করিয়ে নিলেন । এ দিকে রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা । ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে , কিছু ফল পেয়েছিলেন । আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা , আর ছিল বাংলা বই যা-তা , তার বাছবিচার ছিল না ।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে , জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি — কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি । এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে , গেলুম রীতিমতো নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে ; কিছু কিছু চেষ্টা হতে লাগল , কিন্তু হয়ে উঠল না ।

মেজবোঠান ছিলেন , ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে , জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে । ইস্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরেছি ; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন , দিয়েছি ফাঁকি । যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা । নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর ।

পালিত সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে । একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম । তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে , বিদেশে এসেছি । মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি । আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে । আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভরতি হয়েছি , ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মরলি । সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয় । সাহিত্য তাঁর মনে , তাঁর গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত — আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপনখোরাক , মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না । বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটে-পালটে বুঝে নিতুম । অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম ।

নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন , আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে । ব্যস্ত হয়ে উঠতেন । তিনি জানতেন না , ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ । প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি । তখনকার ডাক্তারি মতে এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা ।

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র । কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে । আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা । তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল । আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো । ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে । সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয় । সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন ।

বিলেতে গেলেম , বারিস্টর হই নি । জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি , নিজের মধ্যে নিয়েছি পূব-পশ্চিমের হাত মেলানো — আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে ।